ঔপনিবেশিক বাংলায় চিকিৎসাক্ষেত্রে মহিলাদের ভূমিকা : একটি অনুসন্ধান

ত্রয়ী সিনহা

Abstract

Feminist literary history has explored the untold stories of women in different spheres. Colonial Bengal witnessed the rise of a class of women who were culturally, intellectually nourished and educated and they took up the challenges posed by the orthodox society and went on to fulfill their wishes, nevertheless. They began their journey into the world of education with a warning that if a woman be educated her husband would die. The rest is history. Womens health and sanitation is a much-neglected factor still visible in our society. In colonial Bengal the situation was much worse because of the social stigma of taking women patients to male doctors and women were also forbidden to study medicine. In the prejudice-stricken society where the birth of a girl was not welcomed by blowing the conch shell but with wails, it was quite unthinkable to dream of womens' education and that also in the field of medicine. In the present paper I explore the journey of a few selected women in colonial Bengal in the sphere of medicine and health. I attempt to explore the shift of womens' journey from home to hospital and their involvement in both private and public spaces and spheres.

Keywords: Historiography, Untold Stories, Trigger Warning, Women Doctors, Health and Sanitation.

আনন্দীবাই জোশী, অজিতা চক্রবর্তী, হেমলতা গুপ্ত, যামিনী সেন, কাদম্বিনী গাঙ্গুলি এক পঙ্‌ক্তিতে এই নামগুলি উল্লেখের প্রাসঙ্গিকতা থেকে এই প্রবন্ধ লেখার প্রয়াস। আবহমান কাল ধরে মহিলারা সমাজের নানা পেশায় নিজেদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে চলেছেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে পুরুষ চিকিৎসকের পাশাপাশি নিজেদের উপস্থিতি ও কর্মধারা অটুট রাখার জন্য নারীকে কম লড়াই করতে হয়নি। এই লড়াইয়ে একদিকে যেমন তারা কিছুক্ষেত্রে পরিবারের পুরুষ সদস্যদের সমর্থন পেয়েছেন (বেশিরভাগ সময়েই পাননি)

অন্যদিকে তেমনি পরিবারের মহিলা সদস্যদের অসহযোগিতার সম্মুখীনও হয়েছেন বারংবার। বহির্জগতে পুরুষের পাশাপাশি মহিলাদের ডাক্তারি পড়ার ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত আছে নানাবিধ অপমান, অপবাদ ও আত্মত্যাগের কাহিনি। এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য, ঔপনিবেশিক বাংলায় মহিলাদের শিক্ষার প্রেক্ষাপট আলোচনার সঙ্গে চিকিৎসাশাস্ত্র পঠনপাঠন বিষয়ে তাঁরা কীভাবে নিজেদের যাত্রার পথ প্রশস্ত করেছিলেন তা অনুসন্ধান করা। কীভাবে সংস্কারে আচ্ছন্ন সমাজে তাঁরা বিধিনিষেধের বেড়া ভেঙে বাঁধন ছেঁড়ার সাধনে সাফল্যলাভ করেছিলেন এই প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। ঘর এবং বাহির এই দুটি পরিসরের মেলবন্ধনে কিভাবে মহিলাদের জীবনে পরিবর্তন এসেছে সে বিষয়ে অনুসন্ধান করাও এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রবন্ধের মূল অংশে আলোকপাত করার আগে ঊনবিংশ–বিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে বাংলার সমাজে মহিলাদের অবস্থান ও তাদের শিক্ষার চিত্র তুলে ধরা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ঔপনিবেশিক বাংলায় শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এই দুই ক্ষেত্রে মহিলাদের অবস্থান বদলানোর পালা শুরু হয়েছিল সমাজসংস্কারকদের প্রয়াসকে কেন্দ্র করে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব,কেশবচন্দ্র সেন, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি, আনন্দমোহন বসু, শশীপদ বন্দোপাধ্যায় প্রমুখের চেষ্টায় মেয়েরা অন্দরমহল থেকে শুধু যে বাহিরমহলে পা রেখেছিল তাই নয়, নিজেদের অন্তর্নিহিত প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে অনেকটাই সক্ষম হয়েছিল। সাহিত্যের পাতায় এই ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছিল নানাভাবে। শান্তা দেবী তাঁর *স্ত্রীলোকের অধিকার* প্রবন্ধে লিখছেন–

> স্ত্রীপুরুষ সকলেই যখন মানুষ, তখন পুরুষের চিন্তার সহিত পুরুষের চিন্তার সংস্পর্শে যেমন পুরুষ গড়িয়া উঠে, স্ত্রীজাতির চিন্তার সঙ্গে স্ত্রীজাতির চিন্তার মিলনে যেমন স্ত্রীজাতি গড়িয়া উঠে, স্ত্রীপুরুষের চিন্তার আদানপ্রদানে তেমনি পূর্ণ মানুষ গড়িয়া উঠে। মেয়েদের এবং পুরুষের কার্যক্ষেত্র ও চিন্তার ক্ষেত্রের মধ্যে সকল বিষয়ে যখন খুব পরিস্কার গন্ডি টানা নাই, তখন তাহাদের পরস্পরের চিন্তার মিলনেই তাঁহারা নিজেদের খাঁটি রূপ পায় এবং নিজেদের ক্ষেত্র বুঝিয়া লয়, এবং আদর্শকে চিনিতে শিখে।[১](প্রবাসী, পৌষ ১৩২৪)

এই সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক নীতিগুলির যে বিবর্তন ঘটেছিল তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ছিল ভারতীয় তথা বাংলার সমাজের আধুনিকীকরণ এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি ছিল সমাজে নারীর অবস্থার উন্নতি। এই উন্নতির চিত্র ফুটে উঠেছে সেই সময়ে মেয়েদের লেখায়, বিভিন্ন পরিসরে তাঁদের অংশগ্রহণ এবং অন্যান্য নানা সামাজিক কাজের মধ্য দিয়ে। এই সময়কে সত্যবালা দেবী তুলে ধরলেন নিজের কলমে–

> এখন যে যুগ আসিয়াছে, এটা universal emancipation এর যুগ। এ যুগে মধ্য এশিয়া বা আফ্রিকার মধ্যেও মানুষের স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বিচিত্র নহে। হিন্দুর মেয়েদের প্রাণে যদি কোন চাঞ্চল্য জাগে, মাত্র সেইটাই কি বিচিত্র হইবে? যদি সেটা স্বাভাবিক হয়, তবে এমন কি হইতে পারেনা যে, অবস্থা বুঝিবার পূর্ব–লক্ষ্মণটা অন্তত তাহাদের মধ্যে আসিয়াছে? হয়তো তাহারা বুঝিতে পারিতেছে যে, যেভাবে মাত্র একখানি ছাঁচে তাহাদের জীবনগুলি ঢালাই করা হয়, সেটা প্রকৃতির উপর মানুষের কলমবাজি। হয়তো বা প্রকৃতিই স্বয়ংসচেতন হইয়াছেন।[২] (*কেরোসিনের কালিমা প্রক্ষালন*, সত্যবালা দেবী, ভারতবর্ষ, মাঘ, ১৩২৬)

সুতরাং এই universal emancipation এর যুগে মেয়েরা নিজেদের যেভাবে প্রমাণ করার সুযোগ অর্জন করে নিল সেখান থেকে পরবর্তী সময়ে নানা পরিসরে তাদের যোগদান বাড়ল। ইতিমধ্যে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে যেসব বই প্রকাশিত হয়ে বাঙালি জনমানসে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার রচিত *স্ত্রীশিক্ষা* (১৮২২), কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত *এ প্রাইজ এসে অন নেটিভ ফিমেল এডুকেশন* (১৮৪১), তারাশঙ্কর তর্করত্ন রচিত *ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা* (১৮৫০), হরচন্দ্র দত্ত রচিত *অ্যান অ্যাড্রেস অন নেটিভ ফিমেল এডুকেশন* (১৮৫৬), দ্বারকানাথ রায়ের *স্ত্রী শিক্ষা বিধান* (১৮৫২), রামসুন্দর রায়ের *স্ত্রী ধর্ম বিধায়ক* (১৮৫৯) প্রভৃতি।[৩] পুরুষ লেখকদের পাশাপাশি মহিলা লেখকরাও কলম ধরলেন এবং স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক যে লেখাগুলি উঠে এল তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় কৈলাসবাসিনী দেবী রচিত *হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা*–র কথা যা বামা–লেখনীর একটি মূল্যবান দলিল হিসেবে গণ্য হয়। শিক্ষামূলক বই ও প্রবন্ধ রচনাই শুধু নয়, আত্মজীবনী, মহিলাদের রচিত ভ্রমণ বৃত্তান্ত, বিজ্ঞানভিত্তিক রচনাও সেই সময় সমাজে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছিল। বিভিন্ন সাময়িক পত্রপত্রিকায় যে বিষয়ে মহিলা লেখকদের লেখা প্রকাশিত হত তার মধ্যে বামাবোধিনী, প্রবাসী পত্রিকার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন সূত্র থেকে সরলা দেবী, নিরুপমা দেবী, শান্তা চট্টোপাধ্যায়, হেমলতা দেবী, মৃণালবালা দেবী, প্রফুল্লময়ী দেবী, কামিনী রায়, স্নেহসুধা গুপ্ত, অনুরূপা দেবী সহ আরও অনেকের কথা জানা যায়, যাঁরা সেই সময় নানা বিষয় নিয়ে বামাবোধিনী, প্রবাসীর পাশাপাশি অন্যান্য পত্রিকাতেও কলম ধরেছিলেন। যেসব শিরোনামে মহিলাদের লেখা প্রকাশিত হত তার মধ্যে ছিল বিবিধ বিষয়ের আভাস। একদিকে যেমন অবলা বসু নারী সমবায় ভাণ্ডার বিষয়ে প্রবন্ধ লিখছেন, অন্যদিকে স্বর্ণলতা বসু মেয়েদের ভোটের অধিকার বিষয়ে জনগণকে অবগত করার জন্য কলম ধরছেন। সুলতা করের লেখায় সাহিত্যে ব্যঙ্গরচনা সম্বন্ধে মানুষ যেমন জানার সুযোগ

পাচ্ছেন, তেমনি আবার মৃন্ময়ী রায়ের লেখায় শিশুশিক্ষার ধারা সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়। সাঁতার বিষয়ে শান্তি পালের লেখা প্রবন্ধ সেই সময় শরীর তথা স্বাস্থ্যচর্চা বিষয়ে বিশেষভাবে আলোকপাত করে। এইরকম বহুবিধ বিষয়ে মহিলাদের জ্ঞান ও সচেতনতার কথা জানা যায় বিভিন্ন লেখা থেকে। ইতিহাসবিদ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা *The Nation and its Women* প্রবন্ধে নব্য শিক্ষায় শিক্ষিত মহিলাদের উত্থান এবং তারা যেভাবে অন্দরমহলের সঙ্গে বাহিরমহলের সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন সেই বিবরণ পাওয়া যায় যেখান থেকে New Woman[৪] এর ধারণাটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

সাহিত্যের আঙিনায় আনাগোনার সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য সম্পর্কে মহিলাদের ক্রমবর্ধমান উৎসাহ সেই সময় একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে। অন্দরমহলে মহিলাদের চিকিৎসার জন্য পুরুষ ডাক্তারের প্রবেশ বিষয়টি প্রায় অকল্পনীয় ছিল। মেয়েদের চিকিৎসা করার জন্য বেশীরভাগ পরিবারে ধাত্রীদের সাহায্য নেওয়াই ছিল একমাত্র উপায়। Dyagmar Engels[৫] অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় পর্যবেক্ষণ করে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে ইউরোপ থেকে ভারতে আগত পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত চিকিৎসক ও মহিলা মিশনারিদের ভাবনাচিন্তাকে সমর্থন করার মত মন তখন বেশিরভাগ ভারতবাসী তথা বাঙালির ছিল না। সংস্কারে আচ্ছন্ন সমাজ পুরুষ ডাক্তারের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে মেয়েদের চিকিৎসার চেষ্টা করত, আর ঠিক সময়ে ধাত্রী পাওয়া না গেলে বিনা চিকিৎসায় অনেকের মৃত্যু হত। একথা অনস্বীকার্য যে সেই সময় অনেক ধাত্রী ছিলেন যাঁরা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে দেশীয় গাছগাছড়া দিয়ে নানা রকমের ওষুধ তৈরি করে চিকিৎসা করতেন। এ বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় চিত্রা দেবের *মহিলা ডাক্তার* গ্রন্থে, যেখানে তিনি ধাত্রীদের চিকিৎসা প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের লেখা কবিতার উল্লেখ করেছেন —

ডাক্তার, কবিরাজ রণে যারে হারে।
যদুর জননী গিয়া জয় করে তারে।।
সাবাস, সাবাস, বাছা যদুর জননী।
গঙ্গার নিকটে হার মানে কালাপানি।।[৬]

যদুর মা নামক ধাত্রী যার প্রকৃত নাম জানা যায় না। তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন মানুষের সেবা করে। আর একজন ধাত্রী, রাজুর মা নামে পরিচিত, তার উদ্দেশ্যে অনুরূপ একটি কবিতা রচিত হয়েছিল —

নরুণের কারিকুরি যাই বলিহারি।
নরুণ হারায়ে দিল সাহেবের ছুরি।।
নরুণ তো নয় যেন মদনের শর।
শ্বেতাঙ্গ ডাক্তার মোহে হন জর্জর।।
দিশি থান ফেরা শাড়ি বিলাতি পাজামা।
হারিল শাড়ির কাছে পাজামা মহিমা।।
সাবাস রাজুর মার নরুণের খোঁচা।
মেয়ে হয়ে পুরুষেরে বানাইল বোঁচা।।[৭]

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তাঁর *অবরোধবাসিনী* প্রবন্ধে মুসলিম মহিলাদের চিকিৎসার অব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন। এমন আরও অনেক লেখা মহিলাদের চিকিৎসার অব্যবস্থার সাক্ষ্য বহন করে। এর জন্য সবচেয়ে বড় কারণ ছিল মহিলাদের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য বিষয়ে সমাজের উদাসীনতা। ক্রমে এর প্রতিকার শুরু হয় এবং উনিশ শতকে উচ্চশিক্ষা, চিকিৎসা এবং বিভিন্ন বৃত্তিমূলক বিভাগে মহিলাদের যোগদান করার পথ প্রশস্ত হল। মহিলাদের চিকিৎসক হওয়ার ইচ্ছা এরপর আর স্বপ্ন হয়ে রইল না। এ ব্যাপারে উনিশ শতকে ইংরেজ সরকারের কিছু নীতি এবং দেশীয় সমাজসংস্কারকদের ভূমিকায় মেয়েদের চিকিৎসাশাস্ত্র তথা ডাক্তারি পড়ার পথ প্রশস্ত হল। যদিও উনিশ শতকের শেষের দিকে মহিলারা ডাক্তারি পড়ার প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ পান, তবে ১৮১৩ সালে চার্টার অ্যাক্ট এর মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতিতে ডাক্তারি পড়ার দাবি উত্থাপিত হয়। ১৮২২ সালে তৎকালীন গভর্নর জেনারেলের আদেশ অনুযায়ী নেটিভ মেডিকাল ইন্সটিটিউশন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের দেশীয় ও পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে চিকিৎসা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সংস্কৃত কলেজ ও কলকাতা মাদ্রাসা এই দুই প্রতিষ্ঠানে এই শিক্ষা শুরু হয়। একদিকে চরকসংহিতা ও সুশ্রুতসংহিতা অবলম্বনে এবং অন্যদিকে ইউনানি পদ্ধতিতে চিকিৎসা শিক্ষা দেওয়া শুরু হয়। প্রদীপকুমার বসু, চারু গুপ্ত প্রমুখের লেখায় দেশীয় চিকিৎসার গুরুত্ব স্থান পায়। এরপর বেশ কিছু বছর এইভাবে শিক্ষাদান চলার পর ১৮৩৩ সালে নেটিভ মেডিকাল ইন্সটিটিউশনের অবলুপ্তি ঘটে এবং ১৮৩৫ সালে সরকারি আদেশে ক্যালকাটা মেডিকাল কলেজ–এর প্রতিষ্ঠা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই সময় সমাজ সংস্কারের বেশীরভাগ অংশ ছিল মহিলাদের উন্নতি বিধানের সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে যুক্ত। ১৮৬০ সালে খ্রিষ্টান মিশনারির মহিলা সদস্যরা ভারতবর্ষে এসে নারীশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমনস্কতার প্রয়োজনের দিকটি তুলে ধরেন। এ বিষয়ে তৎকালীন সমাজের উদাসীনতা এবং বিজ্ঞান

শুধু পুরুষের জন্য এই মনোভাবের পরিবর্তনসাধন ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। তাই মহিলাদের ডাক্তারি পড়ার বিষয়টিও ক্রমে গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা পায়। ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুল ১৮৮৮ সাল নাগাদ মহিলাদের ডাক্তারি পড়ার অনুমতি দেয়।

চিকিৎসাসংক্রান্ত বিষয়ে সার্বিকভাবে পরিবর্তন সাধনের মধ্য দিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনসাধন প্রত্যক্ষ করেছিল তৎকালীন বঙ্গসমাজ। জনমানসে বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা এবং মহিলাদের মধ্যে বিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহ বৃদ্ধির দিকে লক্ষ রেখে বাংলায় বেশ কিছু সাময়িক পত্র–পত্রিকা সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য সমাচার, চিকিৎসা সম্মিলনী, চিকিৎসক এই সাময়িক পত্রিকাগুলি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আলোচনা,ডাক্তারিবিদ্যার নানা খুঁটিনাটি, বিভিন্ন ওষুধের উপকারিতা সম্পর্কে জনসাধারনের জ্ঞান ও সচেতনতা বাড়ানোর জন্য নিরন্তর চেষ্টা করছিল। এই পত্রিকাগুলি সকলের বোধগম্য ভাষায় স্বাস্থ্য সংক্রান্ত এবং চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ে বিভিন্ন লেখা প্রকাশ করত। পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র, কবিরাজি, আয়ুর্বেদ, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কিত এমন নানা বিষয়ের উল্লেখ থাকত এই পত্রিকাগুলিতে। ১৮৯৩ সালে বামাবোধিনী পত্রিকার সঙ্গে সঙ্গে ভারতী, অন্তঃপুর প্রভৃতি পত্রিকাগুলিতে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে গৃহ পরিচর্যা, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সুষ্ঠু ব্যবস্থা বিষয়ে বিভিন্ন নির্দেশমূলক লেখা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাগুলিতে যেসব বিষয় আলোচিত হত তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গৃহ পরিচর্যা, মহিলাদের স্বাস্থ্য, গর্ভাবস্থায় সাবধানতা অবলম্বন, নিরাপদ সূতিকাগার, মায়ের ও শিশুর জন্য যথাযথ খাদ্য ও যত্নের ব্যবস্থা। এর পাশাপাশি বাল্যবিবাহের বিরোধিতা, অপরিণত মাতৃত্ব,বিধবাদের অবস্থার উন্নতি,পর্দাপ্রথার অসুবিধাজনক ও কুসংস্কারমূলক দিকের অপসারণ প্রভৃতি দিকের আলোচনাও বাদ যায়নি।

বামাবোধিনী পত্রিকা *সতী* ও *শান্তি* প্রবন্ধে প্রবাদবাক্যের মধ্য দিয়ে মা ও শিশুর যৌথ স্বাস্থ্য সচেতনতার দিকটি তুলে ধরার চেষ্টা করে। চিত্রা দেব তাঁর লেখায় জানান, *যেমন মা তেমনি ছা* ধরনের প্রবাদ প্রয়োগে মায়ের যত্নের মধ্য দিয়েই যে শিশুর যত্ন নেওয়ার পথ প্রশস্ত হয় এই কথা জনমানসে প্রচারের চেষ্টা করা হয়। এছাড়া অন্যান্য প্রবন্ধেও কীভাবে শিশুর যত্ন নেওয়া হবে, তাদের কী ধরনের খাদ্যের অভ্যাস করাতে হবে, খাওয়ানোর সময়, শিশুকে পরিচর্যার উপযুক্ত পদ্ধতি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নানা নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য স্বাস্থ্য নামক সাময়িক পত্রিকায় *ছেলের অসুখ ও মাতার জ্ঞাতব্য* বিষয়ে ডাক্তার ডি. ডি গুপ্ত একটি প্রবন্ধ লেখেন, যেখানে কীভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুর অসুস্থতা নির্ণয় করা যায় এবং শিশুর বিষয়ে মা কীভাবে সাবধানতা অবলম্বন করবেন এমন সব বিষয়ও আলোচিত হয়। অন্তঃপুর পত্রিকায়

ননীবালা দাসীর লেখা দুটি প্রবন্ধও এক্ষেত্রে উল্লেখের দাবি রাখে। *সূতিকাগৃহ*, *সূতিকাগার প্রসূতির শুশ্রূষা* প্রভৃতি প্রবন্ধ থেকে সেকালের মহিলাদের স্বাস্থ্যসচেতনতার কথা জানা যায়। বলাবাহুল্য পত্রিকার নাম থেকে পত্রিকার ভেতরের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অনেক সময়েই ধারণা করা যেত। মহিলাদের অন্দরমহল সংক্রান্ত আলোচনা স্বাভাবিকভাবেই স্থান পেত *অন্তঃপুর* শিরোনামের পত্রিকায়। এরূপ আরও অনেক লেখার মধ্য দিয়ে তৎকালীন চিকিৎসা ব্যবস্থার চিত্র ফুটে ওঠে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সকলেই যে পেশাগত চিকিৎসায় আসতে পারতেন তা নয়, কিন্তু স্বাস্থ্যসংক্রান্ত প্রাথমিক জ্ঞান এবং চিকিৎসকের অনুপস্থিতিতে কিভাবে নিরাপদে শিশুর জন্মদানের প্রক্রিয়া সম্পাদন করা যায় তা নিয়েও এই পত্র–পত্রিকাগুলিতে নানা আলোচনা থাকত। অন্তঃপুরের মহিলাদের অনেকেই এইসব লেখা পড়ে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে দৈনন্দিন জীবনে সেগুলি প্রয়োগের চেষ্টা করতেন এবং তাতে পারিবারিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হত। জীবনীমূলক রচনাতেও মহিলাদের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বিষয়ের উল্লেখ যে শুধু পাওয়া যায় তাই নয়, নানা কাজে তারা কতটা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি প্রয়োগ করছেন সেই উল্লেখও পাওয়া যায়। সুধা মজুমদার[৮] তাঁর লেখায় উল্লেখ করেছেন মহিলা সমিতি পরিচালিত বিভিন্ন কার্যাবলীর কথা যার মধ্যে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আলোচনা বিশেষ গুরুত্ব পায়। স্বামীর কর্মসূত্রে তিনি বিভিন্ন জায়গায় যেতেন এবং নানা ধরনের সামাজিক কাজে লিপ্ত থাকতেন। সচেতনতামূলক শিবির আয়োজনের মধ্য দিয়ে প্রসূতি মৃত্যুর হার, ম্যালেরিয়া ও কলেরার প্রকোপ বিষয়ে মহিলাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি প্রভৃতি বিভিন্ন কর্মসূচির সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। মহিলাদের মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা এবং নানা প্রশিক্ষণ প্রদানের মধ্য দিয়ে সুঅভ্যাসের প্রবর্তন, জীবনযাত্রার মানের উন্নতিসাধন প্রভৃতি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের দক্ষতার প্রসার ঘটানোর চেষ্টা করা হয়।

ডাক্তারি পড়ার পথ প্রশস্ত হওয়ার আগে যেভাবে মহিলাদের চিকিৎসা হত তাতে ধাত্রীবিদ্যার প্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। চিত্রা দেবের *মহিলা ডাক্তার ভিনগ্রহের বাসিন্দা* বইটি থেকে জানা যায় আধুনিক চিকিৎসায় অজ্ঞ ধাত্রীদের অনেকেই তাদের নিজেদের পেশায় যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন। তাদের হাতেই মহিলাদের চিকিৎসার ভার থাকত। মধুসূদন গুপ্ত তাঁর স্বাস্থ্য সমীক্ষায় মহিলাদের আঁতুড় ঘরের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা খুবই অস্বাস্থ্যকর। এই পরিবেশে যথাযথ পরিচ্ছন্নতার অভাবে কত মহিলার যে মৃত্যু হয়েছে তার হিসেব পাওয়া কঠিন। ইতিহাসের পাতায় তথা মানবীবিদ্যার আনাচে–কানাচে বিচরণ করলে আরও যে তথ্য উঠে আসে তা হল এইরকম যে, ধাত্রীরা দেশীয় গাছগাছড়া থেকে যে ওষুধ দিতেন তাতে অসুখবিসুখ সারত। কৈলাসবাসিনী দেবী সূতিকাগারকে গারদ ঘর বলে উল্লেখ করেছেন। কৃষ্ণকুমার মিত্রের সূতিকাগারের বর্ণনা

পাই যেখানে অন্তঃপুরের মধ্যে একখানি চালা প্রস্তুত হত এবং তাতে একটিমাত্র দরজা থাকত, সেই ঘরে দিনরাত আগুন জ্বালিয়ে রাখা হত এবং ধোঁয়া বেরোবার কোন পথ ছিল না। তবে এখানে এই কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় যে এই অব্যবস্থা শুধু এদেশে নয়, বিদেশেও ছিল।

ঔপনিবেশিক বাঙলায় ব্রাহ্মিকাদের কেউ কেউ ধাত্রীবিদ্যা শিখেছিলেন সেবার আদর্শ থেকে। এই প্রসঙ্গে নলিনীবালা চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রী তাপস মুখোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত প্রবন্ধ *সেকালের চিকিৎসায় খড়দা–রহড়ার মহিলামহল* থেকে ঐ অঞ্চলের ধাত্রীদের কথা জানা যায়। রহড়ার কুশি কাওরানি ধাত্রী হিসেবে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। শিবি নামক আরও এক ধাত্রীর কথা জানা যায়। ১৮৭১ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজে দশজন মহিলা ধাত্রী প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করেন। কলকাতা মেডিকেল কলেজে মেয়েদের পড়ার প্রস্তাব উঠেছিল ১৮৭৫ সালে। বাঙালি মেয়েরা ডাক্তারি পড়তে আসার সূচনায় সামাজিক বাধা তেমন ব্যাপক হারে পায়নি তার একটা সম্ভাব্য কারণ হয়তো সমাজসংস্কারকদের উদ্যোগে নারীর জীবনে সংস্কারসাধন এবং ব্রাহ্ম সমাজের সদস্যদের এই কাজে অপরিসীম উৎসাহ। ১৮৭১ সালের আদমসুমারি থেকে জানা যায় সেই সময় বঙ্গদেশে ২৯০ জন মহিলা কবিরাজ, ২১৫ জন মহিলা হাকিম, ২০ হাজার ধাত্রী ছিলেন। ১৮৯১ সালে মহিলা কবিরাজের সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ১৪। বাংলায় মহিলাদের মধ্যে আয়ুর্বেদ পড়ার প্রবণতা ছিল বেশী।

ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুল এবং কলকাতা মেডিকেল কলেজ এই দুই প্রতিষ্ঠানে অনেক মহিলা বিভিন্ন সময়ে ডাক্তারি পড়তে আসেন এবং সাফল্যের সঙ্গে ডিগ্রি লাভ করেন। শুধুমাত্র ডিগ্রি লাভ নয়, তার যথার্থ প্রয়োগের জন্য তাঁদের চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না। ১৮৮২ সালে হেমাঙ্গিনী রায় মেডিকেল কলেজে নার্সিং–এর পাঠ নেন। মেডিকেল কলেজে পড়তে আসা মহিলাদের মধ্যে শুধুমাত্র দেশীয় নয়, বিদেশের মহিলারাও ছিলেন। মেরি ম্যাকডোনাল্ড, হেলেন এ ফক্স, ইডা স্টোলেনবেরি, লিডিয়া জি জ্যাভিয়া, বিন্দুবাসিনী বসু, চারুশশী চট্টোপাধ্যায়, ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ, কৃপাসুন্দরী বসু, অভয়বালা সিংহ, র‍্যাচেল কোহেন, যামিনী সেন, সি এফ ক্লিওফাস, এল পিট, ই এম ওয়াকার প্রমুখ। সেই সময় মহিলারা চিকিৎসাশাস্ত্রে বিভিন্ন উপাধিও লাভ করেছিলেন। ১৯২৪ সালে চট্টগ্রামের নিরুপমাদেবী চিকিৎসাবিশারদ উপাধি পান। ১৯২৬ সালে শৈলবালা দেবী বৈদ্যসরস্বতী, ১৯৩২ সালে আনন্দসুন্দরী এবং অমিয়বালা আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, ১৯৩৮ সালে মিসেস বিমলা সান্যাল আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, ইন্দুপ্রভাদেবী ও সরমাদেবী ভিষকরত্ন, মিসেস প্রভাবতী মজুমদার ধাত্রীরত্ন, ১৯৩৯ সালে সুশীলাদেবী আয়ুর্বেদবিশারদ উপাধি লাভ করেন। বাঙালি মহিলার ডাক্তারি

পড়ার যে দীর্ঘ ইতিহাস তা অনুসন্ধান করলে অনেক তথ্য উঠে আসে।

১৮৭৩ সালে ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলের প্রতিষ্ঠার পর ১৮৭৫ সাল নাগাদ নীলকমল মিত্রের নাতনি বিরাজমোহিনী ডাক্তারি পড়তে আগ্রহী হন। দুর্গামোহন দাসের মেজো মেয়ে অবলা মেডিকেল পড়ার জন্য মাদ্রাজ যান এবং সেখানে সহপাঠী হিসেবে অ্যালেন ডি আব্রুকে পান। ১৮৮৩ সালে আনন্দীবাই জোশী, অ্যানি জগন্নাথন এবং কাদম্বিনী গাঙ্গুলি মেডিকেল পড়া শুরু করেন এবং ১৮৮৫ সাল থেকে কলকাতা মেডিকেল কলেজে নিয়মমাফিক ছাত্রী নেওয়া শুরু হয়। কাদম্বিনী গাঙ্গুলির পৌত্রী পুণ্যলতা চক্রবর্তীর আত্মজীবনী *ছেলেবেলার দিনগুলি* থেকে এবং অন্যান্য আরও নানা সূত্র থেকে তাঁর ডাক্তারি পড়ার সময়ের এবং পরবর্তী জীবনের নানা প্রতিবন্ধকতার কথা আজ অল্পবিস্তর সকল বাঙালিরই জানা। ডাক্তারি পড়া থেকে ডাক্তার হয়ে ওঠা এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজের ভূমিকা যথার্থভাবে পালন করে যাওয়ার অসামান্য দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন কাদম্বিনী গাঙ্গুলি। তাঁর জীবনের ব্যাপ্তি আজ আর শুধু বাঙালি মানসে নয়, বাঙলার বাইরে তথা ভারতে এবং ভারতের বাইরে পরিব্যপ্ত এবং সমাদৃত। ১৮৯০ সালে বিধুমুখী বোস এবং ভার্জিনিয়া মেরি মিত্র নিজেদের প্রতিভা এবং অধ্যবসায়ের বলে কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে এম. বি ডিগ্রি পান। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ১৮৯৪ সালে হুগলীতে ডাফ্রিন মহিলা হাসপাতালে লেডি ডাফ্রিনের আর্থিক সাহায্যে ডাফ্রিন ফান্ড তৈরী হয় যে তহবিলের টাকা মহিলা চিকিৎসক, চিকিৎসাকর্মীর বেতন দেওয়ার মত গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যবহৃত হয়। হুগলি জেলার জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট কুমার গিরীন্দ্রনারায়ণ দেব এ বিষয়ে যথেষ্ট উদ্যোগী ছিলেন এবং তাঁর আর্থিক সহায়তাও এই কাজে যুক্ত হয়েছিল। এইভাবে দেশীয় এবং দেশের বাইরের নানা ব্যক্তিত্ব এবং তাদের আর্থিক সহযোগিতা চিকিৎসার উন্নতি এবং মহিলা চিকিৎসকের কাজের প্রসারে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল।

সমাজের নানা স্তরে যখন নানা ধরনের সংস্কারমূলক কর্মসূচির বাস্তবায়ন হচ্ছিল, তখন একটি দিকের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হল স্ত্রীশিক্ষার যথেষ্ট প্রসার এবং মহিলাদের ডাক্তারি পড়ার সুযোগ তৈরি হলেও অনেক মহিলার পক্ষেই নিজেদের অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগ করার সুযোগ হয়নি। ডাক্তারি পাশ করে লাইসেন্স অর্জন করলেও পিতৃতন্ত্র এবং লিঙ্গ রাজনীতি মহিলাদের এগোনোর পথে যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল যে ধারা আজও বহমান। কাদম্বিনী গাঙ্গুলি এবং যামিনী সেন যে স্বাধীনভাবে প্র্যাকটিস করার সুযোগ পাননি তার মূলে সবচেয়ে বড় কারণ ছিল তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ না দেওয়া। কাদম্বিনীর সঙ্গে ননীবালার পরিচিতির সূত্র ধরে জানা যায় তাঁকে কতখানি প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। উদাহরণ হিসেবে

বলা যায়, একবার যে বাড়িতে কাদম্বিনী প্রসব করাতে যান সেখানে প্রক্রিয়াটি শেষ হওয়ার পরে তাঁকে বাড়ির পরিচারকদের সঙ্গে এক আসনে বসিয়ে শুধু যে পরিবেশন করানো হয়েছিল তাই নয়, তাঁকে নিজের এঁটো পাত পরিষ্কার করতেও বলা হয়। এইরকম ঘটনা প্রায় সব মহিলা ডাক্তারের জীবনে কোন না কোন সময় ঘটেছে যা প্রমাণ করে তাদের কতখানি প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

কাদম্বিনী গাঙ্গুলি, চন্দ্রমুখী বসু ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মহিলা ডাক্তারের নাম উল্লেখ প্রসঙ্গে এই দুটি সর্বাধিক চর্চিত নামের পাশাপাশি ইতিহাস ঘাঁটতে গিয়ে আরও কিছু নাম পাওয়া যায়। ১৮৯০সালে বিধুমুখী বসু এবং পরের বছর তাঁর বোন বিন্দুবাসিনী বসু কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে এম. বি পাশ করেছিলেন। বিধুমুখীর ডাক্তারি জীবন দীর্ঘায়িত হয়েছিল। এরপর আরও এক ব্যতিক্রমী চরিত্র হিসেবে আমরা পাই যামিনী সেনকে। তিনি মেডিকেল কলেজের এম. বি উত্তীর্ণ সফল ছাত্রীদের মধ্যে অন্যতম। ব্রাহ্ম আইনজীবী চণ্ডীচরণ সেনের তৃতীয় কন্যা তথা প্রখ্যাত কবি কামিনী রায়ের বোন যামিনী সেন বাবার ইচ্ছেকে মর্যাদা দিতে গিয়ে নিজের স্বপ্ন ভেঙে যেতে দেননি। বেথুন কলেজ থেকে স্নাতক হওয়ার পর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। নিজের দৃঢ় ব্যক্তিত্ব, চেষ্টা এবং আত্মবিশ্বাসের ফলে ১৮৯৬ সালে ডাক্তারি পাশ করে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে চাইলেও তখনকার সমাজে মহিলা ডাক্তার হিসেবে প্রথমেই ভরসা অর্জন করতে পারেননি। বৈষম্যের শিকার হয়েছিলেন নানাভাবে আর তার বিবরণ পাই কামিনী রায়ের লেখায়–

> সহজে নারী ডাক্তার লোকে ডাকে না, যেখানে বাড়ির বাঁধা পুরুষ ডাক্তার, নিজে পারিবেন না বলিয়া নারী ডাক্তারকে দেখাইতে পরামর্শ দেন, সেইখানে সেই পুরুষ ডাক্তারের মনোনীত নারীকে ডাকা হয়, ফী দিবার সময়েও অনেক অবিচার করা হয়।[৯]

যামিনী সেন সম্পর্কে চিত্রা দেব ছাড়াও আরও যে উৎস থেকে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় তা হল *অনন্যাদের আখ্যান*, যে বইটিতে গ্রন্থকারেরা তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তথ্য তুলে ধরেছেন নানা পত্র–পত্রিকা বা তাঁর বোন তথা লেখক কামিনী রায়ের লেখা থেকে। চিত্রা দেব তাঁর সম্পর্কে যেসব তথ্য দিয়ে পাঠক সমাজকে সমৃদ্ধ করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল যামিনী সেনের লেখা *প্রসূতি তত্ত্ব* (১৯৩২) নামক বইটি। চিকিৎসা করার পাশাপাশি বই লেখার মধ্য দিয়েও তিনি নিজের লব্ধ জ্ঞান সবার সাথে ভাগ করে নিয়েছেন। শাড়িওয়ালি ডাক্তারিন নামে বিখ্যাত যামিনী সেন ভারতবর্ষের নানা জায়গায় চিকিৎসা করেছেন। সিমলা, পুরী, শিকারপুর প্রভৃতি নানা জায়গায় যামিনী সেন চিকিৎসা করেন এবং মহিলা রোগীরা তার কাছে বিনা দ্বিধায় চিকিৎসা করাতে আসতেন। জাদুমণি দেবী, শশীমুখী নাগ, মিস সি বাস্তিন, মিস বি কে গুপ্ত,

মিসেস কিরণশশী চক্রবর্তী, মিসেস এস কে মিত্র, প্রিয়বালা গুহ, পুষ্পময়ী সরকার, রাজলক্ষ্মী দেবী, বিদ্যুৎপ্রভা মল্লিকসহ আরও অনেকের কথা জানা যায় যারা ডাক্তারি পাশ করে বাংলা তথা ভারতের নানা জায়গায় চিকিৎসা করেছেন।

এই প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য বইয়ের কথা বলতে হয়, হেমাঙ্গিনী কুলভির লেখা *সূতিকা চিকিৎসা*। গর্ভবতী মহিলাদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই বইটি বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়। এর সঙ্গে আরও উল্লেখ করতে হয়, ঢাকার প্রখ্যাত সেন পরিবারের মেয়ে হিরণ্ময়ী সেনের কথা। তিনি ১৯২১ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজথেকে এম. বি পাশ করে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেন এবং *সরল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা* নামক বই লিখে যন্ত্রণাহীন চিকিৎসার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য আকর গ্রন্থ রচনা করেন।

ঔপনিবেশিক বাংলায় মহিলা ডাক্তারের সামাজিক অবস্থান ও তাদের পরিস্থিতি আলোচনা করতে গিয়ে মহিলা ডাক্তারদের নিরাপত্তার বিষয়টিও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। সামগ্রিকভাবে আমাদের সমাজে নারী নিরাপত্তার চিত্র যথেষ্ট নৈরাশ্যের ইঙ্গিত বহন করে, তৎকালীন সময়ও তার ব্যতিক্রম ছিল না। ১৯০২ সালে প্রমীলাবালা নামক এক চিকিৎসক মালদায় রোগী দেখতে গিয়ে জমিদার মদনগোপাল চৌধুরীর হেনস্থার শিকার হন।[১০] এইরকম আরও ঘটনার বিবরণ আছে ইতিহাসের আনাচে কানাচে।

স্বাধীনতা আন্দোলনে মহিলা ডাক্তারের অবদানের কথাও জানা যায় বিভিন্ন সূত্র থেকে। ১৯৩১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর সুনীতি চৌধুরী তাঁর স্কুলের সহপাঠী শান্তি ঘোষের সঙ্গে ইংরেজজেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যা করেন। কারাবাস থেকে মুক্ত হওয়ার পর তিনি ডাক্তারি পড়েন। শুধুমাত্র চিকিৎসা করে মানুষের সেবা করাই নয়,দেশের কাজে আত্মোৎসর্গ করতেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল।

এই সময়পর্বে যামিনী সেনের সঙ্গে আরও কিছু মহিলা ডাক্তারের কথা আমরা পাই যার মধ্যে হৈমবতী সেন একটি উল্লেখযোগ্য নাম। তাঁর জীবন গাথায় আছে এমন কিছু জানা–অজানা তথ্য যা সেই সময়ের সমাজচিত্রের একটি দলিল হিসেবে যেমন কাজ করে তেমনি আবার একজন বাঙালি মহিলার কর্মজীবনের সূচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকে আলোকপাত করে থাকে। ডা. হৈমবতী সেন–এর জীবনকথা থেকে জানা যায় ১৮৬৬ সালে পূর্ববঙ্গের খুলনার নৈহাটি শ্রীরামপুরে যে মেয়েটি হৈমবতী ঘোষ নামে জন্মেছিলেন, জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে নানা চমক, বিপর্যয় ও অপমানের মধ্য দিয়ে কীভাবে তিনি ডাক্তার হৈমবতী সেন হয়ে উঠলেন তার ইতিবৃত্ত। দশ বছর বয়সের বালবিধবা মেয়ে থেকে ডাক্তার হৈমবতী সেন এই মেটামরফোসিসের ইতিহাস জানতে গেলে তাঁর আত্মজীবনী পড়ার বিশেষ প্রয়োজন আছে। স্টেথোস্কোপ আর কলমের এক অপরূপ মেলবন্ধন ঘটেছে তাঁর জীবনে। তাঁর পিতামহ শিবনাথ ঘোষ নীলকর সাহেবের

অত্যাচার থেকে নীলচাষীদের অব্যাহতি দেওয়ার প্রয়াস নিয়ে যখন তাদের পাশে দাঁড়ান, তখন থেকেই তাঁদের পরিবারের আর্থিক বিপর্যয়ের সময় শুরু হয়। কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়ার অপরাধে মায়েরা সবসময়ই পরিবারের কাছে মাথা নত করে থাকার দায় বহন করে চলেছেন যুগ যুগ ধরে, হেমের মা–ও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না, কিন্তু প্রথম সন্তান কন্যা হওয়ায় বাবা জমিদার প্রসন্নকুমার ঘোষের প্রতিক্রিয়া ছিল পুরোপুরি বিপরীত। ছেলের অভাব পূরণের জন্য নয়, তখনকার সমাজে ছেলেরা সব রকমের সুযোগ সুবিধা পেয়ে যেভাবে বড় হয়ে উঠত, মেয়েরা বেশিরভাগ সময়েই সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকত এই ভাবনা থেকে স্নেহের চুনিবাবু বা হেমকে ছেলের মত করেই মানুষ করতে চেয়েছিলেন তিনি, সবধরনের সুযোগ দিতে চেয়েছিলেন। মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে বিধবা হয় এই কুসংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারেন নি হেমের মা। তাই তিনি হেমকে কখনই লেখাপড়া শিখতে দিতে চাইতেন না, তবে প্রসন্নকুমার মেয়ের লেখাপড়া শেখার ব্যাপারে প্রবল আগ্রহী ছিলেন। গৃহস্থালির কাজের বদলে লেখাপড়া শিখতে হেমের আগ্রহ ছিল বেশি, প্রসন্নকুমারও অন্দরমহলের গৃহিণীদের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে হেমকে লেখাপড়া করার খানিকটা সুযোগ করে দিতে পেরেছিলেন। সাড়ে নয় বছরের মেয়ে হেম তার বিয়ের আগে পর্যন্ত স্কুলে যাওয়ার বিরল সুযোগ পেয়েছিলেন কেবলমাত্র তার বাবার কল্যাণে। চরিতাবলী, কবিতা কুসুমাঞ্জলি, রামায়ণ, মহাভারত, কালিকাপুরাণ, গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী, ভক্তিরসমৃতা এই সব তিনি পড়ে কণ্ঠস্থ করে ফেলেছিলেন সাড়ে ন'বছর বয়সের মধ্যেই। এরপর থেকে তাঁর জীবনের কঠিন সময় শুরু । পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের তৃতীয়পক্ষের স্ত্রী হিসেবে হেমের বিবাহিত জীবনের সূত্রপাত হয়, আর অচিরেই কৌলীন্যপ্রথা আর বাল্যবিবাহের যৌথ অভিশাপ নেমে এসেছিল তাঁর জীবনে। আগের দুই পক্ষের দুই মেয়ের মা হয়ে বাকি জীবন কাটিয়ে দেওয়ার পথে হেমের যে বাধা এল সেখান থেকে তিনি পরবর্তীকালের ডাক্তার হৈমবতী সেন হয়ে ওঠার পথ তৈরি করেছিলেন নিজের অজান্তে, একটু একটু করে। ১৮৭৬ সালে স্বামীর মৃত্যুর পর বাবা–মায়ের কাছে ফিরে গেলেও ভাইয়ের সংসারে তাঁর ঠাঁই হয়নি। বাবা–মায়ের মৃত্যুর পর বেনারস গিয়ে হেম শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত হন ঠিকই তবে তাঁকে সহায়–সম্বল,আশ্রয়হীন বিধবার জীবনের সবরকম দুর্গতির সম্মুখীন হতে হয়। ততদিনে তিনি কলকাতায় বিধবাদের নিরাপদ আশ্রয় ও লেখাপড়ার সুযোগ সম্বন্ধে অবগত হন এবং কলকাতা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ১৮৭৮ সালে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী, দুর্গামোহন দাস, বিপিনচন্দ্র পাল, কৃষ্ণকুমার মিত্র, আনন্দমোহন বসু সহ আরও অনেকে নারীশিক্ষার উন্নতি, বিধবাবিবাহের প্রবর্তন, বিধবার শিক্ষার ব্যবস্থা, তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রভৃতি সংস্কারমূলক কাজে

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। আত্মজীবনীতে হেম এঁদের সঙ্গে তাঁর পরিচিতির কথা উল্লেখ করেছেন। কলকাতা এসেও হৈমবতীর জীবন কুসুমাস্তীর্ণ হয়নি, একজন বিধবা মেয়ের নিজের ছন্দে চলার সিদ্ধান্ত সমাজ মেনে নিতে পারেনি। নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে তিনি অনেক বাধা–বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছেন, নিরাপত্তার যথেষ্ট অভাব হয়েছে তাঁর জীবনে, কিন্তু সে সব বাধা তাকে খানিক বাড়তি সাহস ও আত্মনির্ভরতার যোগান দিয়েছে। এই অকুতোভয় মনোভাব তাঁর এগিয়ে চলার পাথেয় হয়ে উঠেছে। কলকাতা এসে হেমকে শেষ পর্যন্ত নারীর তথাকথিত নিরাপদ আশ্রয়ের চিরন্তন প্রতিষ্ঠানে ঠাঁই নিতে হয়। ১৮৯০ সালে ২৩ বছর বয়সে কুঞ্জবিহারী সেনের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর প্রকৃত অর্থে হেমের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পথ প্রশস্ত হয়। ১৮২৪ সালে কলকাতায় প্রথম যে মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠা হয় সেখানে ইউনানি, আয়ুর্বেদের পাশাপাশি পাশ্চাত্যের চিকিৎসা শাস্ত্রের পাঠ দেওয়া হত। ১৮৩৫ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক একটি নতুন মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন যেখানে ইউরোপীয় ধাঁচে ইংরাজি ভাষায় ডাক্তারি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। এরপর নানাবিধ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত ১৮৭৩ সাল নাগাদ ক্রমবর্ধমান বাঙালি ছাত্রদের ডাক্তারি পড়ার প্রয়াসকে সমর্থন জানিয়ে ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠা হয় যা পরবর্তীকালে নতুন কলেবরে ক্যাম্পবেল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের রূপ নেয় । ১৮৮৮ সাল নাগাদ ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে মহিলা শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সুযোগ হয়। ১৮৯১ সালে স্বামীর অনুমতি নিয়ে হেম ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন পূরণের জন্য ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হন। মেধাবী হওয়ার জন্য সহজেই কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সাত টাকা মাসিক বৃত্তিতে হেমের লেখাপড়া চলত, স্কুলের ফি তাঁর জন্য মকুব করা হয়েছিল। পরীক্ষায় সর্বাধিক নম্বর পাওয়ার স্বীকৃতিস্বরূপ হেমকে সোনার মেডেল দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে তাঁর পুরুষ সহপাঠীদের মধ্যে প্রবল ক্ষোভ তৈরী হয়। শেষ পর্যন্ত তিনি সোনার মেডেল প্রত্যাখ্যান করেন। স্বর্ণলতা মিত্র, ইদেন্নেসা বিবি প্রমুখ ছিলেন ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে হেমের সহপাঠী। ডাক্তারি পাশ করার পর তিনি হুগলীর ডাফরিন হাসপাতালে কর্মজীবনের সূচনা করেন। সেখানে ১৯১০ সাল পর্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে চিকিৎসক হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

লিঙ্গবৈষম্যের রাজনীতির আরও এক কদর্য রূপ বার বার ধরা পড়ে হেমের প্রতি তাঁর স্বামীর আচরণে। একজন সফল জনদরদী চিকিৎসক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যথাযথ মানুষ হওয়ার যেসব গুণ তাঁর মধ্যে ছিল তা কুঞ্জবিহারী কখনও বোঝেননি, আর তাই তাঁর যোগ্য মূল্যায়ন কখনও হয়নি। চিকিৎসকের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সংসারধর্ম অবহেলা করেননি হৈমবতী। বার বার গর্ভধারণ করতে হয়েছিল তাঁকে, সন্তানদের

লালনপালনেও কোন ত্রুটি রাখেন নি। আর তাই সবদিক বজায় রাখতে গিয়ে তাঁর লড়াই হয়ে উঠেছিল আরও অনেক কঠিন। জীবনের শেষ দশকে এসে নিজের কথা লেখার প্রয়াস করেন আর সেটাই ডাক্তার হৈমবতী সেন সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণালব্ধ তথ্য। স্বামীর মৃত্যুর পর একলা পথের পথিক হয়ে ছেলেমেয়েদের মানুষ করে, তাদের স্বাবলম্বী করে, মানুষের সেবার মধ্যে আজীবন নিজের ধর্ম পালন করে গেছেন। ধ্রুবজ্যোতি, আত্মজ্যোতি, শান্তজ্যোতি, জগজ্যোতি, ভক্তিসুধা এই পাঁচ সন্তানের জননী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর সামাজিক কর্তব্য পালনে অবিরত থেকেছেন। তাই ডাক্তার হৈমবতী সেন শুধু বাঙালি মানসপটে নয়, মহিলা চিকিৎসকের প্রতিরূপ হয়ে আপামর জনসাধারণের কাছে তিনি এক চর্চিত ব্যক্তিত্ব। ১৯৩৩ সালে (আনুমানিক) তাঁর জীবনদীপ নিভে গেছে কিন্তু তাঁর কর্মধারার মধ্যে দিয়ে আমাদের মাঝে তিনি আজও বিরাজমান।

এইভাবে বাঙালি মহিলার ডাক্তারি পড়ার সূচনা ও তার পরবর্তী জীবনের খতিয়ান জানার পথে পা বাড়িয়ে অনেক অনুসন্ধিৎসু মানুষ নানা ধরনের গবেষণার পথে পাড়ি দিয়েছেন, যা বিশ শতক এবং পরবর্তী সময়ে এক বিশেষ ইতিহাসের দিকে নির্দেশ দেয় তা হল মানবীবিদ্যা চর্চার ইতিহাস। এই ইতিহাস নারীকে বিশদভাবে জানার জন্য একটি পরিসর তৈরী করেছে যার পোশাকি নাম মানবীবিদ্যা। এই পরিসরকে জানার মধ্য দিয়ে নারীর জীবনের নানা অধ্যায় প্রতিদিন নতুন করে উন্মোচিত হয় সাধারণ পাঠক এবং গবেষকদের কাছে। এই পরিসরের ব্যপ্তি প্রসঙ্গে বিশ্ববরেণ্য কবি–নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের বিখ্যাত পঙক্তি দিয়ে প্রবন্ধটির উপসংহার নির্দেশ করা যায়—

> So long as men can breathe and eyes can see
> So long lives this and this gives life to thee.[১১]

তথ্যসূত্র :

১। সুতপা ভট্টাচার্য সংকলিত ও সম্পাদিত, বাঙালি মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য ঊনিশ শতক (কলকাতা, সাহিত্য অকাদেমি, ২০১১) চতুর্থ মুদ্রণ, পৃষ্ঠা ৮৯।

২। সুতপা ভট্টাচার্য, বাঙালি মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য ঊনিশ শতক, পৃষ্ঠা ৯৪।

৩। অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, কৈলাসবাসিনী দেবী রচনা সংগ্রহ (কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২০১১) দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা ৩। পৃষ্ঠা ১৫।

৪। ১৮৯৪ সালে আয়ারল্যান্ড এর লেখক এবং নারীবাদী তাত্ত্বিক সারা গ্র্যান্ড তাঁর একটি প্রবন্ধে New Woman প্রথম ব্যবহার করেন। এই শব্দের দ্বারা তিনি নব্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুক্তিবাদী স্বয়ংসম্পূর্ণ নারীকে বুঝিয়েছেন।

৫। Dagmer Engels, The Politics of Childbirth: British and Bengali Women in Contest ১৮৯০–১৯৩০ in P. Robb ed. Society and Ideology: Essays in South Asian History (Delhi: Oxford University Press, ১৯৯৬) .

৬। চিত্রা দেব, মহিলা ডাক্তার ভিনগ্রহের বাসিন্দা (কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৪)।

৭। চিত্রা দেব, মহিলা ডাক্তার ভিনগ্রহের বাসিন্দা।

৮। Shudha Mazumdar, A Pattern of Life- The Memoir of an Indian Woman (New Delhi: Manohar Publishers and Distributors) New edition ২০২০ First edition ১৯৭৭).

৯। অভিজিৎ সেন ও অনিন্দিতা ভাদুড়ী সম্পাদিত, কামিনী রায়ের অগ্রন্থিত গদ্যরচনা (কলকাতা, দেজ পাবলিশিং ও স্কুল অব উইমেন স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৫) পৃ – ৬৩।

১০। চিত্রা দেব, মহিলা ডাক্তার ভিনগ্রহের বাসিন্দা।

১১। William Shakespeare, Sonnet No. ১৮ in Evans Blakemore ed. The Sonnet (New Delhi: Cambridge University Press, Reprint Edition, ২০০০).